

কর্মী ব্যবস্থাপনা ৪- প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মীর সর্বোচ্চ সদ্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তাকে কর্মী ব্যবস্থাপনা বলা হয়। অর্থাৎ কর্মচারী ব্যবস্থাপনা হলো ব্যবস্থাপনার সেই অংশ যা জনশক্তির সঠিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা।

কর্মী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য :

- কর্মীর সর্বোচ্চ সদ্যবহার নিশ্চিতকরণ
- প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য বাস্তবায়ন
- অপব্যয় ও অপচয় হ্রাস
- প্রতিষ্ঠানের টেকসই উন্নয়ন
- সমস্যার সমাধান
- দ্বন্দ্ব নিরসন

কর্মী ব্যবহার কার্যাবলী :

- কর্মীর সর্বোচ্চ সদ্যবহার নিশ্চিতকরণ-এর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন
- কর্মসূচী বা প্রকল্প বা কাজ সম্পর্কে কার্যকর নির্দেশনা প্রদান
- কর্মীদের কার্য বাস্তবায়নের সহায়ক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং সেগুলোর ব্যবহার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা
- সুষ্ঠুভাবে কার্য বাস্তবায়নের জন্য কর্মীকে প্রতিনিয়ত মটিভেশন প্রদান করা
- কর্মীদের কার্যাবলী, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা
- সুপারভিশন ও মনিটরিং কর্মীদের তথ্য কর্মীদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা
- কর্মী পারফরমেন্সের যথাযথ মূল্যায়ন করা
- কর্মী উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা

কর্মী ব্যবস্থাপকের গুণাবলী : তিনিই যোগ্য উত্তম কর্মী ব্যবস্থাপক যিনি অন্যান্য মানুষের সাথে একত্রে কাজ করতে পছন্দ করেন। তবে তাকে আরও বেশ কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। যেমন-

- শ্রম সম্পর্কিত জ্ঞান
- তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন
- কৌশলী
- ব্যক্তিত্ব
- কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

কর্মী ব্যবস্থাপকের করণীয় :

- কর্মীদের কথা গুরুত্ব সহকারে শোনা।
- আপনি যে স্তরের ব্যবস্থাপক হোননা কেন অফিসে সময়ানুবর্তী হোন।
- মিটিং-এ যথাসময়ে পৌঁছান এবং সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আগেভাগেই জানিয়ে দিন।
- সব স্তরের কর্মীকে মানবিক মর্যাদা দিন।
- সময় থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে ডেকে আলোচনা করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিন।
- নিয়মিত বা মাঝে মাঝে কর্মীর কর্ম এলাকা পরিদর্শনে যান।
- কর্মীদের কাছ থেকে সর্বদা শিক্ষা নিতে চেষ্টা করুন।
- মিটিং-এ নিজে কম কথা বলুন, অন্যদের বেশী বলতে সুযোগ দিন।
- অন্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্যের উপর আস্থা রাখুন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে কেউ ভুল করলে সেটা স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করুন।
- কর্মীদের পরিণত ভাবুন।
- অপরকে যা শিখাবেন সেই শিক্ষা নিজে মেনে চলুন।

- নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার সাথে একই আচরন করুন।
- রুঢ় আচরন না করে নীতিতে কঠোর হোন।
- নিজেকে কখনও বিচ্ছিন্ন করবেননা, প্রয়োজনে যেকোন স্তরের কর্মী যেন আপনার সাথে সাক্ষাত পেতে পারে।
- কর্মীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি দিন, প্রশংসা করুন।
- আপনার কর্মীর সাথে তাদের সবলতা ও দুর্বলতা তাদের সাথে যুক্তিসহকারে সরাসরি আলোচনা করুন।
- প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কর্মীদের সচেতন করুন।
- “আমির চেয়ে” “আমরা” শব্দটি বেশী ব্যবহার করুন।
- স্পষ্ট ভাষায় কথা বলুন, কর্মীরা আপনার কথা বুঝতে পেরেছে কিনা ভালোভাবে যাচাই করুন।
- আলোচনার জন্য অধঃস্তন কর্মীদের সবসময় আপনার কাছে ডেকে আনবেননা, মাঝে মাঝে তাদের কাছে যান।
- তাদের সুবিধা অসুবিধা, ভালো-মন্দ খোঁজ খবর নিন।
- কোন বিষয়ে কর্মীদের দুর্বলতা থাকলে তা কাটিয়ে উঠতে তাদের সহায়তা করুন।
- কর্মীদের বিনোদনের ব্যবস্থা রাখবেন।

কর্মী ব্যবস্থাপকের বর্জনীয় :

- কর্মীদের প্রতি কখনও কটুবাক্য ব্যবহার করবেননা। ভাবতে চেষ্টা করুন আপনার উর্ধ্বতন আপনার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করলে আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।
- আলোচনার সময় যথাযথ কারণ ছাড়া কাউকে নিরুৎসাহিত করবেন না।
- অপরের সামনে কাউকে অপদস্থ করবেননা। বিশেষত মিটিং -এ কাউকে উপহাস বা অপমান করবেননা। যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তাহলে তাকে সেটা একান্তে ডেকে ব্যবস্থা গ্রহন করুন।
- কোন অবস্থাতেই তোষামোদকে প্রশ্রয় দিবেননা, কর্মীদের কাছ থেকে উপহার না নেয়াই বাঞ্ছনীয়।
- ব্যক্তিগত কাজে কর্মীদের নিয়োজিত করবেননা।
- পুরুষ কর্মীরা মহিলাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য বা কটুক্তি করবেননা, মহিলা কর্মীদের প্রতি আচরনে দ্বিগুন সতর্ক হোন।
- কর্মীদের কখনও অপরিণত ভাববেননা।
- সব সিদ্ধান্ত নিজে নেবেননা, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কর্মীদের মতামত গ্রহন করুন।
- কর্মীরা যেন কোন অবস্থাতেই আপনাকে ভয় না পায়। আপনার হাবভাব যেন তাদের মনে ভীতির সঞ্চার না করে বরং তারা যেন তাদের ভবনগুলো নিয়ে আপনার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে পারে সে ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করুন।
- রুঢ় ভাষায় কথা বলবেননা, হাসি মুখে কথা বলুন, যদি কোন কর্মীকে বিষন্ন হয়ে থাকতে দেখেন তার দিকে হাসিমুখে তাকান।
- প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয় বিবেচনায় আনবেননা।
- আপনার আচরনে বা কথা বলায় দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে না ওঠে। শান্ত মাথায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করুন। বিপদের সময় অবিচল থাকবেন, কোন কর্মীকে এ সময় বকা ঝকা করবেননা। সঙ্কটময় মূহুর্তে আপনার আচরন সহকর্মীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

কর্মীর মনোবল উন্নয়নের পন্থাসমূহ :

- কর্মীদের সমস্যা সমাধান
- অনুকূল কার্য পরিবেশ তৈরী
- কর্মীদের সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের সুযোগ
- কর্মীদের কর্ম ও কার্য মূল্যায়ন

টীম কি : টীম হলো কিছু ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, যারা পারস্পরিক যোগাযোগ, সহযোগিতা, সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সংস্থার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে একত্রে কাজ করে। টীমের সদস্য হওয়া প্রায়গিক অর্থে নিজের চেয়ে বড় একটি স্বত্তার অংশ হওয়াকে বোঝায়। এইরূপ মানসিকতা টীমের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

.....

T = Together(একত্রে) A= Achievement (অর্জন)

E = Every one (প্রত্যেক) M= More (অধিক)

টীম বিল্ডিং এর জন্য ইংরেজী ১২-C অক্ষরের ব্যবহারের মাধ্যমে ১২টিপসের উল্লেখ বা সুপারিশ করা যায়। যেগুলোর মাধ্যমে স্বার্থক ভাবে টীম বিল্ডিং করা এবং টীমের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে টীম সুলফ চেতনা সৃষ্টি করা সম্ভব।

১২-C-এর ব্যাখ্যা :

- Clear expectation (স্বচ্ছ ধারণা/প্রত্যাশা) - Confidence (আস্থা) - Control (নিয়ন্ত্রণ) - Coordination (সমন্বয়) - Communication (যোগাযোগ) - Competency (যোগ্যতা/দক্ষতা)	- Cooperation(সহযোগিতা) - Consequence (ফলাফল) - Collaboration (যৌথভাবে কাজ করা) - Creative innovation (সৃষ্টিশীল পরিবর্তন আনয়ন) - Cultural change (কুষ্টিগত পরিবর্তন) - Consistency (ধারাবাহিকতা)
--	---

টীম স্পিরিট : টীমের অন্তর্গত সকল সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের ভিত্তিতে কার্য পরিচালনার গতিশীলতাই হচ্ছে টীম স্পিরিট। অর্থাৎ টীমের সমন্বিত কাজ করার ইচ্ছা, প্রবণতা, উৎসাহ উদ্দীপনা, মানসিকতা, তাড়না ইত্যাদিই হলো টীম স্পিরিট।

ভালো টীমের বৈশিষ্ট্য :

- টীমের সদস্যদের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা
- খোলামেলা এবং স্বচ্ছতা
- সহযোগিতা এবং বিশ্বাস
- দ্বন্দ্ব নিরসনে সহযোগিতা ও ইচ্ছা প্রকাশ
- সংশ্লিষ্টজনক নেতৃত্ব
- প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন
- ব্যক্তিগত উন্নয়ন
- সহপক্ষের সাথে সুন্দর সম্পর্ক

টীম বিল্ডিং এর প্রয়োজনীয়তা :

- কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় ও কর্মস্থলে অসম প্রতিযোগিতা দূর হয়।
- সকলের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও মতামতের সুযোগ থাকে বিদায় কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
- যৌথভাবে দায়িত্ব বন্টনের ফলে দায়িত্ব বন্টনে সমতা আসে।
- অধিক মানুষের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মিলন ঘটে যা কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।
- দ্বন্দ্ব তৈরী হয় না, বরং দ্বন্দ্ব নিরসনে কার্যকরী ভূমিকা রাখা যায়।
- সময় সচেতনতা তৈরী হয়।
- সকল কাজ সম্পর্কে সকলের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা থাকে এবং নিজেদের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান ঘটে।
- টীম সদস্যদের সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণ থাকে বিদায় সকলের মধ্যে কাজের প্রতি মালিকানা বোধ তৈরী হয়।
- কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায় বিদায় ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা তৈরী হয়।
- যে কোন কাজের ফলাফল অত্যন্ত ইতিবাচক হয়।

কখন একটি টীম বিফল হয় :

- যখন টীমকে কোন কর্তৃত্ব অর্পন করা হয় না।
- কর্মসূচী বাস্তবায়নে যখন সম্মিলিত সক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।
- যখন অর্পিত দায়িত্ব পালনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।
- যখন টীম সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নষ্ট হবে।
- যখন টীম সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিবর্গ প্রাধান্য পাবে।
- টীম লিডারের নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়লে।

দ্বন্দ্ব ও চাপ ব্যবস্থাপনা

দ্বন্দ্ব : দ্বন্দ্ব বলতে এক পক্ষের অধিকার, স্বার্থ বা সুবিধাদি অন্য পক্ষ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, বিঘ্নিত বা ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্পর্কিত আচরণকে বুঝায়। দ্বন্দ্ব সাধারণত লক্ষ্য, মূল্যবোধ, হতাশা বা অনুভূতি জড়িত অধিকার, স্বার্থ বা সুবিধাদি বাঘাত্ত্ব বা বিঘ্নিত হওয়ায় ভয় হতে সৃষ্টি হতে পারে। একজন অন্যদের অধিকার, অনুভূতি, হতাশা, মূল্যবোধ বা লক্ষ্য সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করতে পারে না, কিন্তু দ্বন্দ্ব জনিত ক্ষয়ক্ষতি হতে রক্ষা করতে বিষয়টিকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

দ্বন্দ্বের প্রধান প্রধান কারণ :

- ভুল বুঝাবুঝি
- ব্যক্তিত্বের লড়াই
- লক্ষ্যের ভিন্নতা
- সম্পাদিত কাজের মান নিম্ন ও পরিমাণ কম হওয়া
- বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার
- দায়িত্ব সম্পর্কিত সমস্যা
- সহযোগিতার অভাব
- কর্তৃত্ব সম্পর্কিত সমস্যা
- হতাশা
- সীমিত সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা
- নীতি ও নিয়মকানুন মেনে না চলা
- স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতি
- সাম্প্রদায়িকতা
- আঞ্চলিকতা

দ্বন্দ্বের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ : বিরোধ মানেই সমস্যা নয় ইহার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার প্রভাব রয়েছে।

দ্বন্দ্বের ইতিবাচক দিকসমূহ :-

- কোন আলোচনার সূত্রপাত করতে সাহায্য করে ;
- সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে;
- মানুষের কোন বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত হওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়;
- মানুষের মধ্যে যোগাযোগের উন্নয়ন করে;
- মানুষের মধ্যে পুঞ্জীভূত আবেগ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়;
- মানুষের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে।
- আত্ম-মূল্যায়নের সুযোগ থাকে
- দলীয় সদস্যদের সহজে চেনা যায়
- নতুন সংস্কার আসতে পারে।

দ্বন্দ্বের ক্ষতিকর দিকগুলো হলো :

- সর্বদা মানুসিক চাপের মুখে থাকতে হয় ;
- সম্পদের ক্ষণতি হয়;
- সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়;
- জীবনের ক্ষতি হতে পারে ;
- কর্মীদের মন ভেঙ্গে যেতে পারে ;
- কর্মতাড়না হ্রাস পেতে পারে
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সমস্যা হতে পারে
- নতুন কোন পরিবর্তন আসতে পারে
- একাধিক নেতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে
- উপদলীয় কোন্দল বাড়তে পারে
- ব্যক্তিগত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে
- পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ হ্রাস পেতে পারে
- অসুস্থ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেতে পারে

- ভার সাম্য নষ্ট হতে পারে
- সংস্থার ভাবমূর্তি বিনষ্ট হতে পারে
- জবাবদিহীতার পদ্ধতি চালু হতে পারে

দ্বন্দ্ব নিরসনের কৌশল/উপায় :

- উপেক্ষা করা
- ধামাচাপা দেয়া
- মুখোমুখি হওয়া/সংলাপে বসা
- বাধ্য করা
- আপোস মিমাংসা করা
- মধুভাষন ইত্যাদি।

আপোষ মিমাংসা করার দক্ষতাসমূহ : আপোষ মিমাংসা সফল ভাবে করতে হলে কিছু দক্ষতা থাকা প্রয়োজন যার প্রয়োগ ঘটতে হবে।

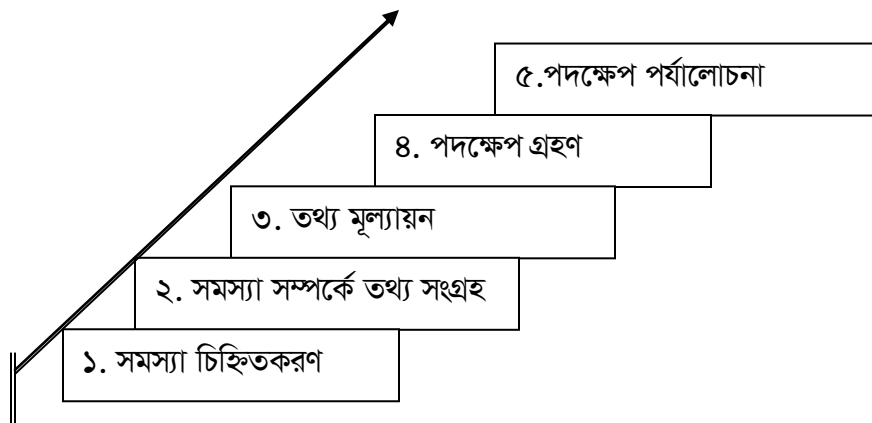
দক্ষতা গুলো হচ্ছে -

১. বিরোধের ধরণ চিহ্নিত করা
২. মোকাবেলা করার উদ্যোগ নেয়া
৩. প্রতিপক্ষের বক্তব্য শোনা
৪. সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয়া

সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয়ার পদক্ষেপ :

- সমস্যা ব্যাখ্যা করা ও বাস্তব সমস্যা তুলে ধরা ;
- একাধিক সমাধান তুলে ধরা এবং প্রতিটির মূল্যায়ন করা।
- সবাই মিলে (ভোট নয়) যৌথভাবে সর্বোত্তম সমাধানটি গ্রহণ করা ;
- সমাধান কিভাবে কার্যকর করা হবে তার পরিকল্পনা করা ;
- সর্বশেষে সমাধানটি যখন বাস্তবায়িত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর তার মূল্যায়ন করা।

দ্বন্দ্ব নিরসনে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা :



চাপ ব্যবস্থাপনা

চাপ ৪ মন ও শরীরের উপর সৃষ্ট কোন অস্বস্তিকর অবস্থাই হলো চাপ।

চাপের ক্ষেত্র ও কারণ :

ক্ষেত্র	কারণ
চাকুরীর কাজের ক্ষেত্রে	➤ অতিরিক্ত কাজ
	➤ চাকুরীর অশিষ্টতা
	➤ কর্ম দক্ষতার অভাব
	➤ দায়িত্ববোধ
	➤ ক্যারিয়ারের সাথে চাকুরীর বৈষম্য
	➤ পরিবর্তন
কর্মদলের ক্ষেত্রে	➤ সহকর্মীদের সাথে অসামঞ্জস্যতা
	➤ সহকর্মীদের সাথে দ্বন্দ্ব
	➤ মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, মূতের অমিল
সংস্থার ক্ষেত্রে	➤ সংস্থার নিয়ন্ত্রনের ধরন
	➤ ব্যবস্থাপনার ধরন
	➤ কর্ম পরিবেশ
ব্যক্তিগত	➤ গরম
	➤ ঠান্ডা
	➤ দূষণ
	➤ গোলযোগ

চাপ দূরীকরণের উপায় :

ব্যক্তির ক্ষেত্রে	সংস্থা/ব্যবস্থাপকের ক্ষেত্রে
➤ কাজের দক্ষতা বাড়ানো ➤ সময় ব্যবস্থাপনা - কাজের তালিকা তৈরী - অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা - সহকর্মীর সহযোগীতা নেয়া ➤ চিন্তাবিনোদন (বিশ্রাম, খেলাধুলা, গল্প, ছুটি) ➤ পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ ➤ অনুশীলন	➤ কাজ সুযম বন্টন ➤ কর্মীদের কাজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো ➤ কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ (কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ) ➤ বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ➤ কর্মীদের কাজ নিজে করে নেয়া ➤ কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করা ➤ কর্মীদের বিভিন্ন অসুবিধা দূর করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

যোগাযোগ : যোগাযোগ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি বার্তা (ধ্যাণ-ধারণা, অনুভূতি, তথ্য) উৎস (একক কিংবা সংগঠন) কর্তৃক এক বা একাধিক ব্যক্তির (গ্রহণকারী) কাছে পৌঁছে এমনভাবে যাতে করে প্রত্যেকেই বার্তাটির অর্থ, উদ্দেশ্য ও ব্যবহার সম্পর্কে বুঝতে পারে।

উন্নয়ন যোগাযোগ : উন্নয়নের জন্য যে যোগাযোগ তাকে উন্নয়ন যোগাযোগ বলে। উন্নয়ন যোগাযোগ তিনটি কারণে হয়ে থাকে। এগুলো হলো তথ্য সরবরাহ করা, শিক্ষা দেওয়া ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা। এ ধরনের যোগাযোগকে উন্নয়ন যোগাযোগ বলে।

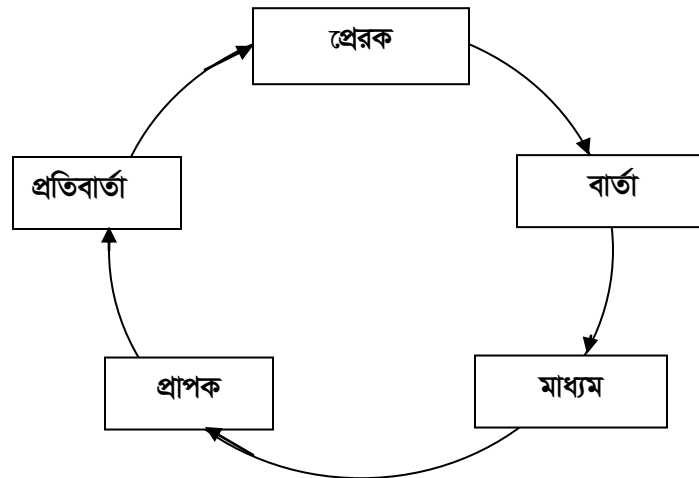
যোগাযোগের উদ্দেশ্য :

- নতুন ধ্যাণ-ধারণা প্রকাশ করার জন্য
- তথ্য পাওয়া ও দেয়ার জন্য
- অন্যের মতামত জানার জন্য
- ধারণাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য
- উদ্বুদ্ধ এবং সচেতন করার জন্য
- কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য
- শিখন প্রদানের জন্য
- পরামর্শ প্রদানের জন্য
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য

কার্যকরী যোগাযোগের উপাদান :

- প্রেরক
- বার্তা
- প্রাপক
- মাধ্যম
- প্রতিবার্তা

যোগাযোগ প্রক্রিয়া :



কার্যকরী যোগাযোগের জন্য বার্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি বার্তা কেমন হওয়া উচিত সেদিকে নজর দেওয়া খুবই প্রয়োজন। বার্তা হবে 3- S এর আলোকে নিম্নরূপ :-

- S= Simple (সাধারণ)
- S= Short (ছোট)
- S= Sweet (শ্রুতি মধুর)

যোগাযোগের বাধা :

- ধারণা/জ্ঞানগত বাধা
- দক্ষতার অভাব
- সামাজিক বাধা
- মনস্তাত্ত্বিক বাধা

যোগাযোগের ধরণ :

- লিখিত যোগাযোগ
- মৌখিক যোগাযোগ
- সাংকেতিক যোগাযোগ

যোগাযোগ কর্মীর গুণাবলী :

- যোগাযোগ প্রক্রিয়া কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে
- জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কলা কৌশল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
- বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে
- পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হবে
- বন্ধু ভাবাপন্ন হওয়া ও শ্রদ্ধাশীল থাকা
- দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা
- সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা
- সহানুভূতিশীলতা প্রদর্শন করা
- যোগাযোগ উপকরন প্রদর্শন ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকা
- জনগণের সাথে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা
- বিষয়বস্তু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা

যোগাযোগের কৌশল :

- বক্তব্যের বিষয় সুস্পষ্ট করে নেওয়া
- প্রাপকের ধরন জেনে নেওয়া
- পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া
- প্রাপকের চাহিদা অনুযায়ী যোগাযোগ করা
- যোগাযোগকারীকে অবশ্যই ভালো শ্রোতা হতে হবে
- কারো মূল্যবোধ বা বিশ্বাসে আঘাত না করা
- নিজেকে/নিজের মতামতকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা
- সমালোচনা গ্রহণের মানসিকতা থাকা
- নিজের উপর আত্মবিশ্বাস থাকা
- নিজের অঙ্গতা ও সীমাবদ্ধতা স্বীকার করা
- আদেশসূচক শব্দ বা আচরণ পরিহার করা

কার্যকরী যোগাযোগের শর্তাবলী :

- বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন
- সহজ-সরল বা বোধগম্য ভাষার ব্যবহার
- অঞ্চল অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার ও সংস্কৃতি চর্চা
- সহানুভূতি প্রয়োগ
- অনুকূল মনোভাব প্রদর্শন/সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার
- জ্ঞানসম্পন্ন পৌঁছানোর দক্ষতা অর্জন
- ধৈর্যশীল শ্রোতা হবার যোগ্যতা অর্জন
- পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা।

নতুন গ্রামে প্রবেশ

আশঙ্ক্য ব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়নের নীতিমালা-

- মানুষকে সম্বোধন ধরে ডাকুন।
- মানুষের সাথে কথা বলুন।
- মানুষের সাথে মিষ্টি ব্যবহার করুন।
- সাহায্যকারী ও বন্ধুত্বপূর্ণ হউন।
- সবাইকে সাদরে গ্রহণ করুন।
- মানুষের প্রতি আগ্রহান্বিত হউন।
- প্রশংসা করতে উদার চিন্তাশীল হউন।
- অন্যের অনুভূতির প্রতি বিবেচনা প্রবণ হউন
- সেবা এবং কাজ করতে সতর্ক হউন।

যাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়-

- এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে (স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক, ডাক্তার, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি)।
- সুবিধাভোগী/লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তিগণ এর সাথে।
- সুবিধাভোগী/লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তির অবভাবকগণের সাথে।
- স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বরগণের সাথে।
- স্থানীয় সরকারী-বেসরকারী অফিস এর সাথে (প্রশাসন, আদালত, ব্যাংক, পোস্ট অফিস ইত্যাদি)।
- স্থানীয় ইমাম/পুরোহিতগণের সাথে।
- স্থানীয় ক্লাব/সংঘ/সমিতির প্রতিনিধি এর সাথে।
- স্থানীয় হাট/বাজার/বন্দরের ব্যবসায়ীগণের সাথে।
- একই ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও কর্মীদের সাথে।

নতুন এলাকার প্রবেশ ও সম্পর্ক তৈরীর কৌশল -

বুঝতে হবেঃ ■ এলাকার সমাজ ব্যবস্থা ■ এলাকার সংস্কার ■ এলাকার মূল্যবোধ ■ জনগণের বিকাশ ■ জনগণের সমস্যা	জানতে হবেঃ ■ ভৌলিক তথ্য ■ এলাকার পরিমাণ ■ সামাজিক সম্পদ ■ পারিবারিক সম্পদ ■ স্থানীয় সুযোগ
বিশ্বাস করতে হবেঃ ■ কর্তা নয়-জনগণের বন্ধু ■ পরামর্শদাতা নয়-পরামর্শ তৈরীর সহায়ক ■ জনগণ বোকা নয়-পরিকল্পনার যোগ্য অংশীদার	বোঝাতে হবেঃ ■ নিজের পরিচয় ■ সংগঠনের পরিচয় ■ সংগঠনের উদ্দেশ্য ■ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ■ প্রকল্পের কার্যক্রম ■ কার্যক্রম পদ্ধতি ■ কার্যক্রমের প্রত্যাশা

তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন :-

তত্ত্বাবধান : কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব -কর্তব্য পালনে কতটুকু যত্নবান ও সক্ষম সে বিষয়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে যাচাই করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়াকে তত্ত্বাবধান বলে।

- তত্ত্বাবধানের সময় যে দিকগুলি দেখতে হয়
- কর্মী নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে কিনা।
- কর্মী অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছে কিনা
- তার দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা এবং উপযুক্ত দক্ষতা আছে কিনা।
- কর্মী কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দৃঢ় এবং কর্মসূচীর সাথে একাত্ম।
- দায়িত্ব পালনে কর্মীর নিজস্ব ও কর্মসূচী ভিত্তিক সুবিধা ও অসুবিধা।
- কর্মসূচী বাস্তবায়নের সমস্যা ও বাধা।

Style of Supervision : There are different styles of supervision, i.e.

- Autocratic (do what I say)
- Anarchic style (বিশৃঙ্খল) (do what you like) and
- Democratic style (let us agree on what we are to do)

Some Techniques of Supervising :

- How to give order
- How to get help from staff
- How to make decision
- How to criticize
- How to settle grievance (দুঃখ, দুদর্শা)
- How to deal with problem staff
- How to deal with misconduct (অব্যবস্থাপনা, অসদাচরণ)
- How to deal with inefficiency (অকার্যকারিতা, দুর্বলতা)
- How to handle long distance supervision

Purpose of Supervision :

- To achieve desire goal
- Proper guidance
- Assist in accomplishing task
- Counseling
- Develop a sense of support from higher authority
- To know the problems
- Identify deficiency of the worker
- Enhance the efficiency
- Modify the work place
- Complete the task in schedule time

সুপারভিশনের মূলনীতি :-

- সুপারভিশন অবশ্যই পরিকল্পিত হতে হবে।
- সুপারভিশন চেকলিস্ট অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে
- মূল অসংগতি সমূহ অবশ্যই রেকর্ড করতে হবে
- সুপারভিশনে প্রাপ্ত মেজর অসংগতিসমূহ ফলোআপ করতে হবে
- সুপারভিশনের রিপোর্ট উর্দ্ধতন কর্মকর্তার কাছে পেশ করতে হবে
- রেকর্ডিং, রিপোর্ট , মনিটরিং ফরম সুপারভিশনে ব্যবহার করতে হবে।

সুপারভিশনে সে বিষয়গুলো পরিত্যাগ করতে হবে :

- লোকালয়ে কঠোর তিরস্কার করা
- পক্ষপাতিত্ব করা।
- দূর্বল নির্দেশনা
- কর্মীর ভুলকে প্রত্যাখান করা।
- ভুল-ত্রুটি খোঁজার মানসিকতা।
- সফট ও সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা না করার মানসিকতা।
- মাত্রাতিরিক্ত সুপারভিশন।
- ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রবেশ।
- অধীনস্থদের অবিশ্বাস করা।
- দায়িত্ব প্রদানে ব্যর্থতা।
- ভালো পারফরমেন্স এর জন্য প্রয়োজনীয় টুলস, ম্যাটেরিয়ালস, ইকুইপমেন্টস সরবরাহ না করা।
- সময়মত সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হওয়া।
- অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়া।
- মিথ্যা ও গুজবে উৎসাহিত করা।
- স্বৈরাতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ করা।
- সাব-অর্ডিনেটদের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা।

মনিটরিং : মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ হচ্ছে এমন নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া বা বাস্তবায়নাত্মক কোন লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা নির্ণয় করা এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কর্মসূচীর পরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি, লক্ষ্য স্থির, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা।

অর্থাৎ মনিটরিং হচ্ছে -

- কার্যক্রম ও ফলাফলকে যাচাই করা।
- প্রকৃত অবস্থা ও পরিকল্পিত অবস্থার মধ্যে তুলনা করা।
- সংশোধনমূলক কার্যক্রম সুপারিশ করা।

মনিটরিং এ যে দিকগুলি দেখা হয় :

- লক্ষ্য অর্জনে গ্রহীত কার্যক্রম কতটা সংগতিপূর্ণ।
- কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা।
- বাজেট অনুযায়ী খরচাদি হচ্ছে কিনা।
- তহবিলের পর্যাপ্ততার সাথে সংগতি রেখে নগদ আদান-প্রদান হচ্ছে কিনা।
- কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত সকল কর্মী/কর্মচারীদের কর্মতৎপরতা যাচাই।
- কর্মসূচীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার পর্যালোচনা।
- কর্মসূচী পরিচালনায় শিক্ষণীয় কি ছিল তা লিপিবদ্ধ করা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে তা ব্যবহার করা।

মনিটরিং ও সুপারভিশনের মধ্যে পার্থক্য :

মনিটরিং	সুপারভিশন
কাজের উপর জোর দেয়া হয়	কর্মীর উপর জোর দেয়া হয়
কোন মন্ডব্য করেনা বা মতামত প্রদানে বিরত থাকে	মতামত প্রদান করে এবং পরামর্শ দিয়ে থাকে
মনিটরিং করে প্রশাসনিকভাবে বাইরের লোক	সুপারভিশন করে প্রশাসনিকভাবে ভিতরের লোক
একজন মনিটর সুপারভাইজার হয়	একজন সুপারভাইজার মনিটর হয়না
শুধুমাত্র প্রকল্পের ঘাটতির দিকে গুরুত্ব দেয়	ঘাটতির পাশাপাশি অধীনস্থদের নিজ নিজ উন্নয়নে সহায়তা করা হয়
ব্যবস্থাপনার চোখ কান	ব্যবস্থাপনার বর্ধিত হাত
মনিটরিং হলো বিজ্ঞান সম্মত ও সিস্টেমটিক	তদারকী বেশী সিস্টেমটিক নয়
Works with data and information	Work directly in the field
For taking next step	Takes immediate step
Related to evaluation	Related to implementation

সুপারভিশন ও মনিটরিং শেষে ব্যবস্থাপকের করণীয় :

কোচিং : কোচিং হচ্ছে কর্মী উন্নয়নের একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মীর কর্ম দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। কোচিং হচ্ছে নির্দেশনা ও সহায়তা সমাহার। এটি একটি সক্রিয় পদ্ধতি যার মাধ্যমে কর্মীকে বাস্তব ক্ষেত্রে তার কাজ করার দক্ষতা পরিমাপ করা যায় এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহযোগিতা তাত্ক্ষণিক প্রদান করা যায়। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কোচিংকে অনেকটা ফুটবল টিমের কোচিং এর মত মনে করা হয়।

কোচিং এর ধাপ :

- কর্মীর দক্ষতা বিশ্লেষণ ও ঘাটতি নির্ধারণ
- ঘাটতি পূরণের কৌশল নির্ধারণ
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপরে কোচিং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত হওয়া।
- সমস্যা সম্পর্কে কর্মীর ধারণা এবং অভিজ্ঞতা বর্ণনার সুযোগ দেয়া।
- কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্মীর নিকট সুপারভাইজারের কি প্রত্যাশা তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা।
- এ ব্যাপারে কর্মী সুপারভাইজারের কাছে কি প্রত্যাশা করে তা ব্যক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।
- কর্মীর সংশ্লিষ্ট কোন পেশাগত দিক উন্নয়ন প্রয়োজন তা যৌথভাবে খুঁজে বের করা।
- যৌথভাবে পেশাগত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা।
- কর্মীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ফলোআপ রাখা।
- পরবর্তী পর্যালোচনার তারিখ নির্ধারণ করা।

মেন্টরিং : মেন্টরিং কোন নির্দেশনামূলক প্রক্রিয়া নয়। বরং এখানে কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন বা দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য কর্মীকে বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা হয়। ফলে কর্মী নিজের ভুলত্রুটি সংশোধনের উপায় বা কৌশল বেছে নিতে পারে। অর্থাৎ সুপারভাইজার কর্মীকে তার নিজের বা অন্যের অভিজ্ঞতা বা ফলাফলগুলো বর্ণনা করেন মাত্র, যা থেকে কর্মী শিক্ষা নিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে।

কাউন্সেলিং : কাউন্সেলিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কর্মী তার নিজের উন্নয়ন বা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দসই সমাধানের পথ খুঁজে বের করে এবং সে অনুযায়ী নিজের উন্নয়ন ঘটায়। এক্ষেত্রে সুপারভাইজার শুধুমাত্র সহায়কের ভূমিকা পালন করে, কোনভাবেই সমাধানের পথ বলে দেননা।

ফিডব্যাক : ফিডব্যাক হলো কোন বিসয়ের গুণাগুণ সম্পর্কে ঐ বিষয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের মতামত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার নিজেকে অন্যের পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে জানতে পারে। একটি ফিডব্যাক হওয়া উচিত-

- স্বচ্ছ, বিষয় ভিত্তিক এবং গঠনমূলক
- মতিভেদনাল
- গ্রহণযোগ্য
- ইতিবাচক

মূল্যায়ন : মূল্যায়ন হলো একটি সময় ভিত্তিক যাচাই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রকল্প বা কর্মসূচীর সঠিকতা জানা যায় অর্থাৎ প্রকল্প বা কর্মসূচীর ভাল-মন্দ যাচাই করাই হলো মূল্যায়ন।

পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন এর মধ্যে পার্থক্য :

পরিবিক্ষণ	মূল্যায়ন
• চলমান প্রক্রিয়া • ডাটা নির্ধারণ করতে হয় • বিচ্যুতি নির্ধারণে সহায়তা করে • আভ্যন্তরীণ বিভাগ দ্বারা পরিবিক্ষণ করা হয় • প্রাথমিক তথ্য নির্ভর • মনিটরিং ঘটনার গভীরে কারণ খোঁজে না • অধিকন্তু গুণাবাচক • নমুনায়নের ভিত্তিতে করা হয় • অপেক্ষাকৃত দ্রুত প্রক্রিয়া	• প্রকল্পের মেয়াদ শেষে বা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর • উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতে হয় • পলিসি তৈরী এবং কর্মসূচী পুনরায় সাজাতে সহায়তা করে • বহিঃস্থ/আভ্যন্তরীণ সংস্থা/দপ্তর দ্বারা পরিবিক্ষণ করা হয় • প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তথ্য নির্ভর • মনিটরিং ঘটনার গভীরে কারণ খোঁজে • গুণাবাচক ও সংখ্যা বাচক • নমুনায়নের ভিত্তিতে করা হয় না • অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ প্রক্রিয়া

মূল্যায়ন কখন করা হয় :

প্রকল্পের ধরন বা সময় কালের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নের সময় নির্ধারণ করা হয়। মেন ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে কাজ বাস্‌ড় বায়নের পর মূল্যায়ন করা হয়। অপরদিকে মাঝারী বা বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে মধ্য পর্যায়ে এক বা একাধিক বার মধ্যকালীন মূল্যায়ন করতে হয়। মধ্যকালীন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো বাস্‌ড়বায়িত কাজের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী কাজ গুলোকে যুগোপযোগী করা যাতে করে প্রকল্প বাস্‌ড়বায়ন শেষে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হয়। কিন্তু ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন সুযোগ থাকে না।

মনিটরিং ও মূল্যায়নের ধাপসমূহ :

প্রথম ধাপ	: মনিটরিং এর বিভিন্ন কাজ অনুসারে সুনির্দিষ্ট স্টাফ নিযুক্তকরণ।
দ্বিতীয় ধাপ	: প্রকল্পের/কর্মসূচীর নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যে মনিটরিং এর জন্য সেগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে নির্দেশক এবং যাচাই এর মাধ্যম নির্ধারণ।
তৃতীয় ধাপ	: নির্দেশক এবং প্রতিবেদন এর জন্য যথার্থ মনিটরিং টুলস্ (ফরমেট) প্রণয়ন।
চতুর্থ ধাপ	: (ক) নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় তথ্য চিহ্নিত করণ। (খ) তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র, পদ্ধতি এবং উত্তরদাতা নির্ধারণ।
পঞ্চম ধাপ	: তথ্য সংগ্রহ।
ষষ্ঠ ধাপ	: নির্দেশক ভিত্তিক সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশেষণ।
সপ্তম ধাপ	: আদর্শ নির্দেশকের সাথে বিশেষণের ফলাফল এর সম্পর্ক স্থাপন।
অষ্টম ধাপ	: সংশোধনমূলক কার্যক্রমের প্রস্‌ড়বনা/সুপারিশ প্রদান।
নবম ধাপ	: ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদানের জন্য একটি মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন।

নেতৃত্ব :

নেতৃত্বের সংজ্ঞা :- নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কোন দল বা গোষ্ঠীর আচরণ ও কাজকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে নিয়ে উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকেই নেতৃত্ব বলা হয়। যিনি এ দায়িত্ব পালন করেন তাকে নেতা বা Leader বলে। একজন ব্যবস্থাপক তার অধীনস্থ লোকদের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে পরিচালনা করেন বিধায় ব্যবস্থাপককেও নেতা হিসাবে গণ্য করা যায়।

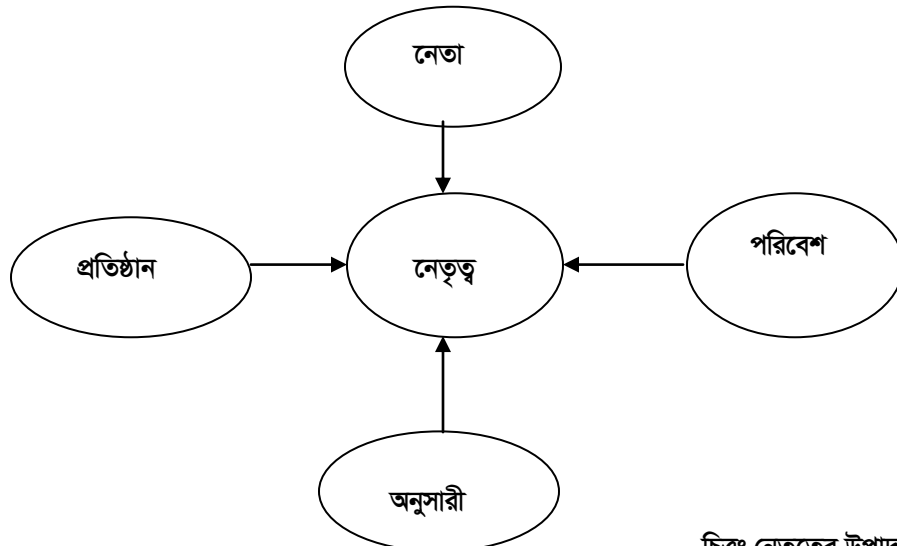
নেতৃত্বের ধরণ :- সমাজে বিভিন্ন ধরণের নেতা ও তাদের নেতৃত্ব দেখা যায়। কাজের বৈশিষ্ট্য ও কাজের ধরণ অনুযায়ী নেতা বা নেতৃত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

- স্বৈরাতান্ত্রিক নেতৃত্ব
- অংশগ্রহণমূলক/গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব
- অবাধ নেতৃত্ব
- স্বৈরাতান্ত্রিক নেতৃত্ব :- যে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এককভাবে নেতার নিকট কেন্দ্রীভূত থাকে তাকে স্বৈরাতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে।
- অংশগ্রহণমূলক/গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব :- যে নেতৃত্বে নেতা ও দলীয় সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার থাকে অর্থাৎ নেতা তার দলীয় সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা গ্রহণ করে থাকেন সেই ধরনের নেতৃত্বকে গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব বলে।
- অবাধ নেতৃত্ব :- এ নেতৃত্বে নেতার কোনরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দলের ওপর থাকেনা। এক্ষেত্রে কর্মীরা কাজ করেন। নিজেরাই সংগঠনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও সমস্যা চিহ্নিতকরণের কাজ করেন এ ব্যাপারে নেতার ভূমিকা একবারেই কম। নেতার ভূমিকা অনেকটা সদস্যদের অনুরূপ। অধঃস্ৰব্দের অনুরোধে অনেক সময় সামান্য পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

Four leadership styles for any development organization should be following :

- Directive : (নতুন স্টাফদের জন্য সরাসরি নির্দেশনা)
- Coaching (পুরাতন স্টাফদের সরাসরি নির্দেশ না দিয়ে বুঝিয়ে বলা)
- Supportive (মধ্য স্তরের স্টাফদের সরাসরি নির্দেশ না দিয়ে কাজের জন্য সহযোগিতা প্রত্যাশা করা)
- Delegate (উচ্চ স্তরের কর্মকর্তাদের কাজের নির্দেশনা না দিয়ে পরামর্শ দেওয়া)

নেতৃত্বের উপাদান :- (Elements of Leadership) :- নেতৃত্ব হলো লক্ষ্যার্জনের জন্য অধঃস্ৰব্দের প্রভাবিত কৌশল বা প্রক্রিয়া। উপাদান বলতে কোন কিছু অপরিহার্য অংশ অথবা কোন কিছুর চরিত্র বা রূপ সৃষ্টি করে এমন অঙ্গীভূত বিষয়াদিকে বুঝানো হয়। নেতৃত্বকে একটা কৌশল ধরা হলে তা কতিপয় বিসয়ের সমন্বয়ে গঠিত ও বিকশিত হয়। নিম্নে মডেলের সাহায্যে তা উপস্থাপিত হলো :



চিত্রঃ নেতৃত্বের উপাদান মডেল

নেতার গুণ ৪- নেতার গুণ নেতৃত্বের মূখ্য উপাদান হিসেবে গণ্য। নেতা যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ্য হন, প্রয়োজন জ্ঞানের অধিকারী হন, কর্মক্ষেত্রে দক্ষ হন, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মত সামর্থ্যবান হন তবে স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বের মান ও বৈশিষ্ট্য তার প্রতিফলন ঘটে।

নেতার আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ৪- নেতার ক্ষমতা নেতৃত্বকে শক্তিশালী করে। সাংগঠনিকভাবে একজন নেতা যদি যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হন, তবে নেতৃত্বকে তা প্রভাবিত করে। অধিক ক্ষমতা যেমনি নেতাকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে তেমনি সীমিত ক্ষমতা নেতাকে কার্যকর নেতৃত্ব প্রদানে বাধা দেয়।

অধঃপন জনশক্তির মান ৪ অধঃপন জনশক্তি বা অনুসারীদের মান নেতৃত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অধঃপন জনশক্তি যোগ্য ও দক্ষ হলে নেতা নেতৃত্বদানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অধঃপনরা নিম্ন মনোবলের অধিকারী হলে সেক্ষেত্রে নেতার নিকট থেকে কার্যকর নেতৃত্ব প্রত্যাশা করা যায় না।

অধঃপনদের মনোভাব ৪- অধঃপন বা অনুসারীরা নেতা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে তার ওপর নেতৃত্বের প্রকৃতি নির্ভর করে। নেতৃত্ব সম্পর্কে যদি জনশক্তি হতাশ ও নিরাসক্ত থাকে সেখানে নেতৃত্ব স্বেচ্ছাচারী, জনকল্যাণবিমূখ ও উদাসীন হয়। আনুগত্য ও শৃঙ্খলা ৪ প্রতিষ্ঠানের আনুগত্য ও শৃঙ্খলার মান নেতৃত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অধঃপন জনশক্তি বা অনুসারীদের মধ্যে আনুগত্যের ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বিরাজ করলে সেখানে নেতৃত্ব এককভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়। অন্যদিকে অনুসারীদের মধ্যে অবাধ্যতা ও প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করলে সেখানে নেতৃত্ব কার্যকর হতে পারে না।

আলঙ্ঘ্য ব্যক্তিক সম্পর্ক ৪- প্রতিষ্ঠানের জনশক্তির মধ্যে আলঙ্ঘ্য ব্যক্তিক সম্পর্ক নেতৃত্বের মান ও বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। নেতার সাথে অনুসারীদের এবং অনুসারীদের নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক যদি উন্নত হয় তবে নেতৃত্ব অধিক কার্যকর হতে পারে। অনুসারীদের সাথে নেতার সম্পর্ক যত নিকটবর্তী হয় ততই নেতা সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ নেতৃত্বদানে সক্ষম হন।

প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ৪- লক্ষ্যও নেতৃত্বকে প্রভাবিত করে। লক্ষ্য যত গুরুত্বপূর্ণ হয় নেতার এবং অধঃপন জনশক্তির মানসিক ও বৈষয়িক প্রস্তুতিও ততই বেশী হয়ে থাকে। লক্ষ্যের মধ্যে যদি নতুনত্ব থাকে এবং তা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয় তবে নেতৃত্ব ও ইতিবাচক এবং উদ্যমী হয়। লক্ষ্য গতানুগতিক হলে নেতৃত্ব ও গতানুগতিক হয়ে থাকে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ৪- যোগাযোগ ব্যবস্থা নেতৃত্বের একটা অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য। অনুসারী বা অধঃপনদের প্রভাবিত করে লক্ষ্যার্জনের কৌশলই হলো নেতৃত্ব। এই প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে নেতা ও অনুসারীদের মধ্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরূপ যোগাযোগ সহজ ও ফলপ্রসূ হলে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পায়। ফলে গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণ মূলক নেতৃত্ব বিকাশ লাভ করে।

পরিবেশ পরিস্থিতি ৪- পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকেও নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। পরিস্থিতি অনুকূলে হলে নেতৃত্বের ধরণ এক ধরনের হয়, অন্যদিকে পরিস্থিতি ভিন্নতর হলে নেতৃত্ব সেই মানের হয় না। বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা নেতৃত্বে যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তার পিছনে পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাব লক্ষণীয়।

প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য ৪ সাংগঠনিক ঐতিহ্যের কারণে নেতৃত্ব ভিন্নতর হয়ে থাকে। কোন প্রতিষ্ঠানে আমলাতন্ত্রের প্রভাব সক্রিয় হলে সেখানে নেতৃত্বের মধ্যে ধীরগতি ও অতি-আনুষ্ঠানিকতার ভাবধারা গড়ে ওঠে। এরূপ প্রভাব কম হলে নেতৃত্ব বলিষ্ঠ ও সাবলীল হতে পারে।

যোগ্য নেতৃত্বের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য ৪-

অধঃপনদের সম্পর্ক ধারণা ৪ অধঃপনদের মান, দক্ষতা, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে নেতার জানা থাকলেই শুধুমাত্র অনুসারীদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

অনুসারীদের সাথে সহ-অবস্থান ৪ নেতা ও অনুসারীদের সহ-অবস্থান, যোগ্য নেতৃত্বের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। নেতা কর্মীদের নিকট হতে অনেক দূরে অবস্থান করেন সেক্ষেত্রে ঐ নেতৃত্ব কখনই কার্যকর হতে পারে না।

পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধান : যোগ্য নেতৃত্বের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, একে সবসময়ই পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধান করে চলতে হয়। যে নেতা যতবেশি পরিবেশ বুঝে অধঃস্ৰুণদের আদেশ-নির্দেশ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করবেন তার পক্ষে ততবেশি সফলতা লাভ করা সম্ভব।

অধঃস্ৰুণদের আনুগত্য : অধঃস্ৰুণদের আনুগত্য না থাকলে নেতৃত্ব কখনই সফলকাম হতে পারে না। অবশ্য নেতা যদি তার আচরণ ও গুণাবলির মাধ্যমে অধঃস্ৰুণদের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন সেক্ষেত্রে অধঃস্ৰুণদের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য লাভও সম্ভব হয়।

অধঃস্ৰুণদের প্রেরণা দানঃ- যোগ্য নেতা তার ব্যক্তিত্ব ও আচরণের মাধ্যমে অধঃস্ৰুণদের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে কাজ আদায়ের চেষ্টা করেন।

অনুসারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ : নেতার সাথে অধঃস্ৰুণ কর্মীদের যদি যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থাকে সেক্ষেত্রে কার্যকর নেতৃত্বের প্রশ্নই আসে না। তাই নেতার চিন্তা, ধ্যান ধারণা ও কর্মপন্থা সম্পর্কে অধঃস্ৰুণদের অবহিতকরণ এবং কর্মীদের প্রতিক্রিয়া ও কর্ম প্রচেষ্টা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সবটাই যোগাযোগ নির্ভর।

সমতা ও কর্তৃত্বের উপস্থিতি :- নেতৃত্বের সাথে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। নেতার আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বের কারণে অধঃস্ৰুণরা তার অনুসরণ করে। নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হলে অধঃস্ৰুণনা বাধ্যতামূলকভাবে তার আনুগত্য করে। তবে নেতা যদি তাঁর আচার-আচরণ ও গুণাবলির মাধ্যমে অধঃস্ৰুণদের মনে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে পারেন সেক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং অধঃস্ৰুণদের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য লাভ সম্ভব হয়।

ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা :- যে কোন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব যেহেতু নেতৃত্বের ওপর থাকে ফলে যে কোন ঝুঁকির উদ্ভব হলে নেতৃত্ব তা মানতে সব সময়ই বাধ্য থাকে।

নেতৃত্ব কতিপয় গুণের সমষ্টি :- অধঃস্ৰুণদের চিন্তা-চেতনা ও কাজকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে পরিচালনা করতে গিয়ে যোগ্য নেতাকে অবশ্যই কতিপয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়।

নেতৃত্ব শক্তির সাথে তুলনীয় :- নেতৃত্ব দুর্বল হলে অনুসারীদের কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করে; আবার নেতৃত্ব শক্তিশালী হলে অনুসারীদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তাই নেতৃত্বহীন জনশক্তি মাঝিহীন নৌকার সঙ্গে তুলনীয়।

নেতার ক্ষমতার উৎস বা ভিত্তি : নেতৃত্ব হলো লক্ষ্যার্জনের জন্য অধঃস্ৰুণদের প্রভাবিত করার কৌশল বা প্রক্রিয়া। অন্যদিকে ক্ষমতা হলো অন্যদের আচরণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য। তাই যে নেতার অধঃস্ৰুণদের প্রভাবিত করার সামর্থ্য বা ক্ষমতা বেশি তার পক্ষেই তত সফলতার সাথে নেতৃত্বদান সম্ভব। একজন নেতার ক্ষমতা কতটা হবে তা যেমনি আনুষ্ঠানিক কতিপয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে তেমনি তিনি এই আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা কতটা যোগ্যতা বা সফলতার সাথে প্রয়োগ করতে পারছেন তার উপরও নির্ভরশীল।



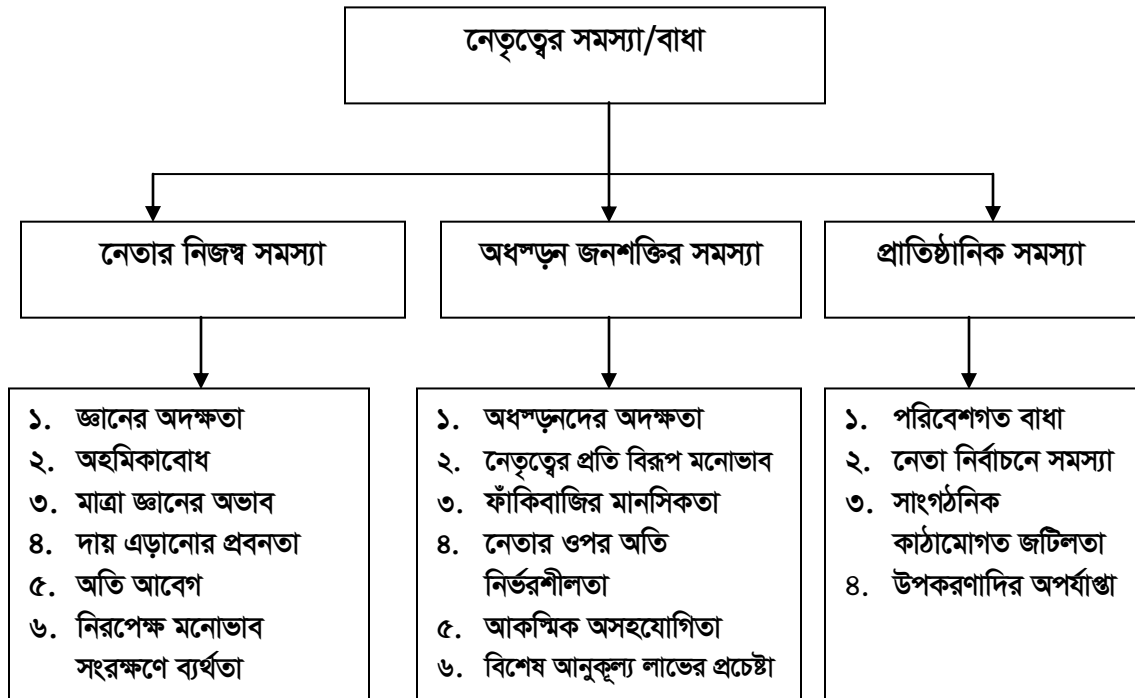
নেতার ক্ষমতার উৎস আলোচনা করা হলো :

আইনানুগ ক্ষমতা :- আইনানুগ ক্ষমতা বা বৈধ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের পদ মর্যাদা থেকে উদ্ভূত হয়। প্রতিষ্ঠানের একজন সাধারণ ব্যবস্থাপক বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের চেয়ে কম ক্ষমতা ভোগ করে। এই ক্ষমতা বলেই উর্দ্ধতন অধঃতনকে সহজে প্রভাবিত করে।

বাধ্য করার ক্ষমতা :- বাধ্য করার ক্ষমতা বলতে অধঃতনদের প্রয়োজনে শাসিড় প্রদান, ভয় দেখানো বা দমন করার ক্ষমতাকে বুঝায়। এরূপ ক্ষমতা সব সময় একজন নেতা প্রয়োগ করবেন এমন নয়। তবে প্রয়োজনে তিন তা ব্যবহার করতে পারেন এমন ধারণা অধঃতনদের মনে থাকলে উর্দ্ধতনের পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগ সহজ হয়।

পুরস্কৃতকরণের ক্ষমতা :- এরূপ ক্ষমতা দমনমূলক ক্ষমতার বিপরীত। এ ধরনের ক্ষমতা অধঃতনদের পুরস্কার প্রদানের সামর্থ্য থেকে উদ্ভূত হয়। এক্ষেত্রে অধঃতন মনে করে, যদি সে উর্দ্ধতনের নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করে বা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে তবে তাকে ভাল হেড প্রদান করা হবে, পদোন্নতি দেয়া হবে।

নেতৃত্বের পথে বাধা বা সমস্যা :- কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জন অনেকাংশ নির্ভর করে সঠিক নেতৃত্বের উপর। কর্মীর কার্য-সম্পাদনে সঠিক নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। নেতা কার্যক্ষেত্রে অধঃতন কর্মীগণকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে নেতৃত্বকে সহজ মনে হলেও সফল নেতৃত্ব নিশ্চিত করা খুবই জটিল এবং কঠিন ব্যাপার। কতিপয় বিশেষ উপাদান সফল নেতৃত্ব সমস্যা সৃষ্টি করে। নিম্নে নেতৃত্বের সমস্যা বা বাধা সৃষ্টিকারী উপাদান সমূহ উল্লেখ করা হলো :



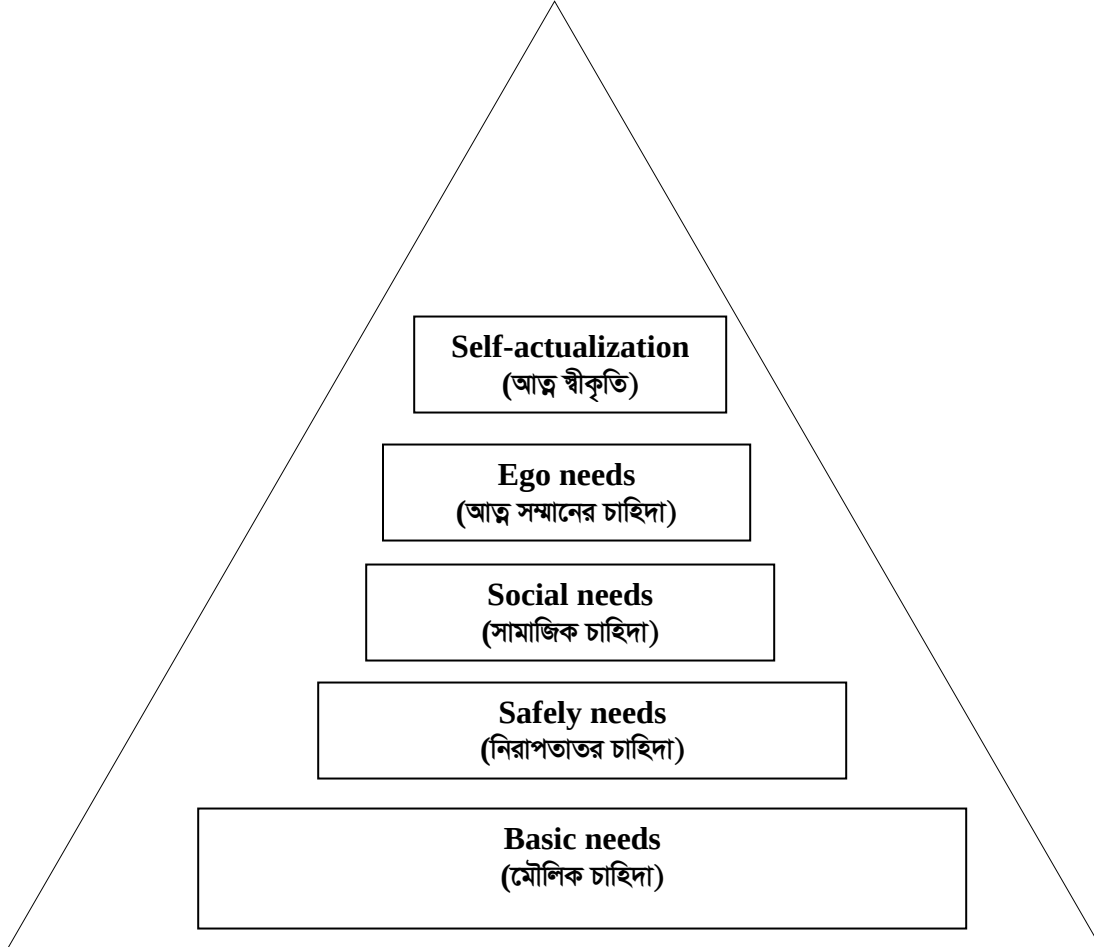
যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলী :

- ভাল শ্রোতা ও বক্তা
- শিক্ষা অভিজ্ঞতা
- আশাবাদী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী
- মূল্যবোধ সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান
- প্রতিদ্বন্দ্বীতা
- ভুল স্বীকার করা
- ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা
- সৃজনশীলতা
- সাহস ও দৃঢ় মনোবল
- ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা
- সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা
- ধৈর্য্য, সততা ও আন্তরিকতা
- যোগাযোগের দক্ষতা
- সামাজিক দক্ষতা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা
- উৎসাহদানের ক্ষমতা
- বিশেষ- ষণের ক্ষমতা
- সময় সচেতনতা
- নমনীয় মনোভাব

উদ্বুদ্ধকরণ :-

উদ্বুদ্ধকরণ (Motivation) : উদ্বুদ্ধকরণের ইংরেজী প্রতিশব্দ Motivation যা ল্যাটিন শব্দ Motivus থেকে নেয়া। যার অর্থ হচ্ছে তাড়না। খুব সহজ কথায় বলা যায় মানুষের মনে কোন কিছু শেখা বা করার জন্য আগ্রহ জাগিয়ে তোলাই উদ্বুদ্ধকরণ। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণের পরিবর্তন আনার জন্য আগ্রহী করে তোলা হয় তাই উদ্বুদ্ধকরণ।

উদ্বুদ্ধকরণের (Motivation) এর ক্ষেত্রে -Maslow-এর চাহিদা তত্ত্ব :



Maslow's Theory

উদ্বুদ্ধকরণের গুরুত্ব :

- ব্যক্তির মধ্যে কাজ করার অনুপ্রেরণা তৈরী হয় ;
- মানুষের মধ্যে কোন কিছু করার তাড়না তৈরী হয়;
- ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়; এবং
- এ কাজটি আমাদের করতে হবে'- ব্যক্তির মধ্যে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী হয়।

উদ্বুদ্ধকরণের কৌশল :

- সুন্দর ভূমিকা দিয়ে উপস্থাপনা শুরু করা
- লক্ষিত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা। (যেমন-যোগ্যতা, পারিবারিক অবস্থা, সংস্কৃতি, ধর্ম, মনোভাব, ইত্যাদি)
- মানুষের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির করার কৌশলগুলো যথাযথ প্রয়োগ করা
- বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা মনোবল থাকা
- বিষয় উপস্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা
- উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা, বক্তাবীর মধ্যে কোন প্রকার জড়তা না থাকা
- বিষয় সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা নেওয়ার জন্য লক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে প্রশ্ন আহবান করা।
- কার্যক্রমের ভাল ও মন্দ দিকগুলো তুলে ধরা, এক্ষেত্রে ভাল দিকগুলো বেশী করে তুলে ধরা
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভাববার সময় দেওয়া
- তথ্যের উৎসগুলো প্রয়োজনে উল্লেখ করা
- সহজ-সরল যুক্তি/উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা
- লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিষয়ভিত্তিক মনোযোগ দিয়ে শুনছে, না বিরক্ত হচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখা
- মার্জিত পোষাক পরিধান করা
- বয়স্ক নীতিমালা অনুসরণ করা
- কোনভাবেই হতাশাবাদ প্রদর্শন না করা
- নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা
- সংস্থার ভাবমূর্তির নষ্ট না করা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহস প্রদান করা
- কথা গুলিয়ে বলা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা
- নিজে আত্মবিশ্বাসী হওয়া
- নিজ চারিত্রিক দুর্দ্বারা বজায় রাখা।

❖ আর্থিক উদ্বুদ্ধকরণ/প্রেষণা

- ন্যায্য বেতন
- বোনাস
- আর্থিক নিরাপত্তা
- অগ্রিম ও ঋণ
- বাসস্থান সুবিধা
- চিকিৎসা সুবিধা
- পদোন্নতি
- পুরস্কার
- ক্যান্টিন সুবিধা
- চাকুরীর নিরাপত্তা

❖ অনার্থিক উদ্বুদ্ধকরণ/প্রেষণা

- ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অধিকার
- সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ
- নিরাপত্তা
- আকর্ষণীয় কাজ
- উত্তম ব্যবহার
- ভাল কাজের প্রশংসা করা
- প্রশিক্ষণ সুবিধা
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা

- অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান
- অভিজ্ঞতা বিনিময় করা
- কর্মীর ধারণা লিপিবদ্ধ করা
- বিশেষ কাজের প্রশংসা করা
- ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীলতা
- প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা।

❖ শাখা ব্যবস্থাপকের কাজের বিবরণ :

আইডিএফ-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শাখা ব্যবস্থাপক তার নিজ শাখায় কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিবেন। শাখার প্রশাসনিক কাঠামোর শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করে তিনি তার শাখায় একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলবেন। শাখার সকল আর্থিক লেন-দেন ও হিসাব রক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব তার উপর অর্পিত থাকবে।

(ক) শাখার সিনিয়র ফিল্ড অর্গানাইজার, ফিল্ড অর্গানাইজার এবং এসিসটেন্ট ম্যানেজার কর্তৃক কেন্দ্র পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন। শাখার সার্বিক কার্যক্রমের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকী করবেন। সহকর্মীদের কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।

(খ) গ্রুপ স্বীকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট ফরম পূরণ যথাযথভাবে হয়েছে কিনা তা যাচাই পূর্বক স্বাক্ষর করবেন।

(গ) সহকর্মীদের কাছ থেকে ঋণ প্রস্ফুট গ্রহণ করবেন। প্রাপ্ত সকল তথ্যের ভিত্তিতে তিনি একটি ঋণ প্রস্ফুট তৈরী করবেন এবং সকল ঋণ প্রস্ফুট বিবেচনা করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন।

(ঘ) দৈনিক আদায়কৃত কিল্ডি ও সঞ্চয়ের টাকা নিয়মানুসারে ব্যাংকে জমা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন। প্রতিদিনের কিল্ডি ও সঞ্চয়, আদায় ভাউচার, লেজার পোস্টিং, ক্যাশ বুক, ক্লিন ক্যাশ বুক চেক করে স্বাক্ষর করবেন। এছাড়া পাশবই যাচাই পূর্বক স্বাক্ষর করবেন।

(ঙ) সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করবেন এবং আদায় ও ঋণের ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(চ) তিনি প্রয়োজন অনুসারে সংস্থার তার মাখার অধীন বাস্তবায়নরত অন্যান্য কর্মসূচীর কাজের ফলো-আপ করবেন এবং ঋণ কর্মসূচীর সাথে অন্যান্য কর্মসূচীর কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।

(ছ) শাখার কার্যক্রমের উপর মাসিক বর্ণনামূলক ও পরিসংখ্যানমূলক এবং মাসিক হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরী করবেন।

(জ) তিনি শাখার সুষ্ঠু তহবিল ব্যবস্থাপনা করবেন। তিনি শাখার পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত করবেন।

(ঝ) শাখার সকল সহকর্মীর কাজের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করবেন এবং তাদের একান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে তৈরী ও উপস্থাপন করবেন।

(ঞ) শাখায় সদস্য/সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শাখার সিনিয়র ফিল্ড অর্গানাইজার, ফিল্ড অর্গানাইজার এবং এসিসটেন্ট ম্যানেজার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ পর্যালোচনা করবেন এবং বাস্তবায়নের জন্য তৎপর হবেন। তাছাড়াও তিনি নতুন উদ্যোগ গ্রহণে সহকর্মীদেরকে পরামর্শ দিবেন এবং উৎসাহিত করবেন।

(ট) এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঠ) শাখার সকল কাজের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

(ড) শাখা ব্যবস্থাপকের কাজ তদারকী করবেন সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজার।

❖ আদর্শ তত্ত্বাবধানকারী হিসাবে একজন শাখা ব্যবস্থাপক :

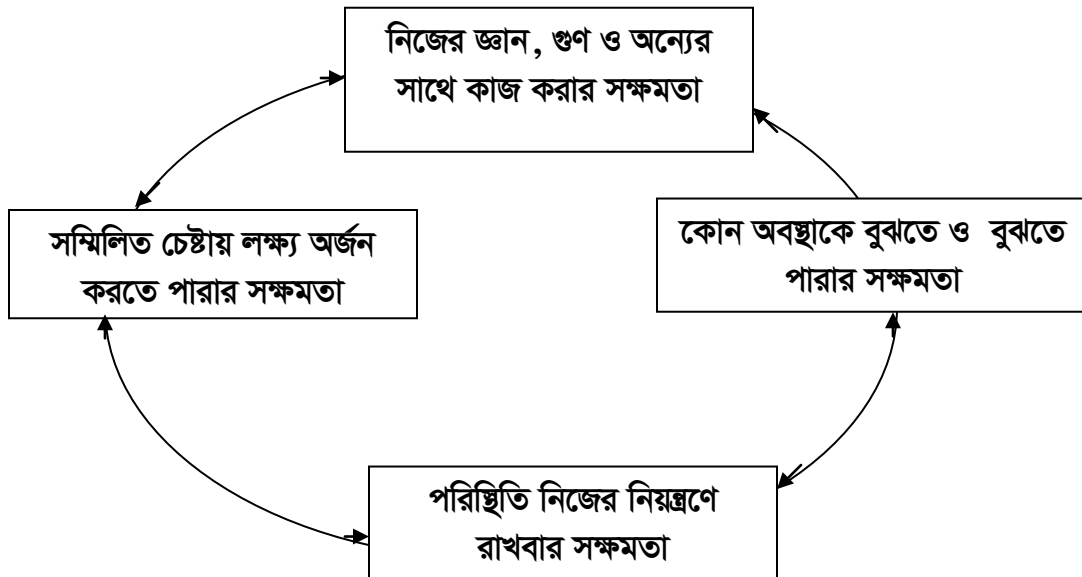
একজন আদর্শ তত্ত্বাবধানকারী তার কর্মীদের বুঝাতে, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে, কর্মঠ হিসাবে গড়ে সক্ষম। তিনি একজন ভালো পরিকল্পনাকারী, ভালো কর্মবন্টনকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিজ্ঞ ও ন্যায্যপরায়ণ। গ্রহণকার ক্লার্ড এস, জর্জ নিম্নলিখিত গুণাবলীর অধিকারী একজন ব্যবস্থাপককে আদর্শ তত্ত্বাবধানকারী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

- লক্ষ্য অর্জন করতে, সাফল্য লাভে এবং উন্নতি লাভে আগ্রহী।
- পরিস্কারভাবে লক্ষ্য স্থির করার দক্ষতার অধিকারী।
- তার ধারণা বা সিদ্ধান্ত অপরের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম
- উদ্যোগী
- চিন্তা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী
- সততা
- কাজ ও কর্মীদেরকে সংগঠিত করতে পারে
- লোকদের দ্বারা ও মাধ্যমে কাজ করাতে পারে
- কঠিন সমস্যার সমাধান করার ও শক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম
- গতিশীল ও অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম
- কর্মীদেরকে মূল্যায়ন এবং তাদের ব্যক্তিগত সবলতা, দুর্বলতা বুঝতে সক্ষম
- ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব
- অধীনস্থদের উপর কার্যভার ও কর্তৃত্ব ন্যস্ত করার মনোভাবী
- প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও স্বার্থকে ইচ্ছা ও আশা আকঙ্কায় উপরে স্থান দানের মনোভাবী
- ন্যায্যপরায়ণ ও বিজ্ঞ।

Six Key factors of team Development

- Commitment
- Trust
- Purpose
- Communication
- Involvement
- Process Orientation

একজন নেতার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য চারটি মৌলিক সক্ষমতা থাকা



❖ দলের সক্ষমতা বাড়ানো শীট

ক্রঃ নং	বিস্তারিত	নিম্ন -১	মধ্য -২	উচ্চতা -৩	সর্বোচ্চ -৪	মন্তব্য
১.	উন্মুক্ত আলোচনা					
২.	বন্ধুত্ব সুলভ কর্মপরিবেশ					
৩.	সমান/সম মালিকানা					
৪.	অংশগ্রহনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ					
৫.	সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহকর্মীদের সম্প্রীক্ত করা					
৬.	নারী পুরুষে বন্ধুত্ব মূলক কর্ম পরিবেশ					
৭.	অপক্ষপাত					
৮.	সহযোগীতা মূলক মনোভাব					

❖ দলের সক্ষমতা বাড়ানো শীট

ক্রঃ নং	বিস্তারিত	নিম্ন -১	মধ্য -২	উচ্চতা -৩	সর্বোচ্চ -৪	মন্তব্য
১.	উন্মুক্ত আলোচনা					
২.	বন্ধুত্ব সুলভ কর্মপরিবেশ					
৩.	সমান/সম মালিকানা					
৪.	অংশগ্রহনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ					

৫.	সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহকর্মীদের সম্প্রিজ্ঞ করা					
৬.	নারী পুরুষে বস্তু মূলক কর্ম পরিবেশ					
৭.	অপক্ষপাত					
৮.	সহযোগীতা মূলক মনোভাব					